শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

শাহজাহান কিবরিয়া

তাম্রলিপি

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প
শাহজাহান কিবরিয়া

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৮০০

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স
২৮/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য : ২৮০.০০

Srestho Kishoregolpo
By : Shahjahan Kibria
First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 280.00 $10

ISBN : 978-984-98737-5-4

উৎসর্গ

ভগ্নি প্রতিম বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
দোরদানা আহমেদ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

খ্যাতিমান চলচ্চিত্র তারকা শর্মিলা ঠাকুর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'আমার তিন সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়কে আমার কাছে তা আমি সঠিক বলতে পারব না।' একথা একজন সৃজনশীল লেখকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোনো লেখককে তার সেরা লেখা বাছাই করতে বললে তিনিও শর্মিলা ঠাকুরের মতো একই জবাব দিতেন। নিজের সম্পর্কে কেউ অবমূল্যায়ন করতে চায় না। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। সৃজনধর্ম লেখা সবসময় আবেগ তাড়িত।

সাধারণত একজন লেখক অভিজ্ঞতার আলোকে তার নিজস্ব ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গল্প বা উপন্যাসের প্লট তৈরি করেন। সেইভাবে মনমতো শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাস করে যিনি তা ভাষায় প্রকাশ করেন। পাঠকের বয়স বিবেচনা করে লিখতে গেলে লেখককে অনেক সময় বিবাদে পড়তে হয়। সকল বয়সের ধারণক্ষমতা সমান নয়। কমবেশি হয়ে থাকে। বড়োদের জন্য লেখা স্বগঠিত গতিতে এগিয়ে যায়, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে লেখা এগিয়ে যায়, তাকে নিয়ন্ত্রণের দরকার হয় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বয়সের সঠিক অর্থাৎ শিশু-কিশোরদের জন্য তেমন করলে চলে না। তাদের জন্য লেখাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হয়। শিশুকিশোরদের জন্য লিখতে গেলে শুধু বিনোদন বা জ্ঞানদানের কথা ভাবলে চলবে না, এখানে লেখককে শিক্ষকের ভূমিকাও পালন করতে হয়। শিশুর ভবিষ্যৎ আছে। বড়োদের ভবিষ্যৎ জগৎ সীমিত। শিশুকে ভবিষ্যতের জন্য উপযোগী করে তৈরি করতে হয়, যেমন মা-বাবা সন্তানের জন্য করে থাকেন। একজন লেখক একাধারে লেখক, মা-বাবা ও শিক্ষক। তাই লেখকের গুরুত্ব মা-বাবা ও শিক্ষকের চেয়ে বেশি।

ছোটগল্প আমাদের শিশু-কিশোরদের বেশি আকর্ষণ করে। ছোটগল্পের বর্ণনা করতে গিয়ে রবি ঠাকুর বলেছেন, 'ছোট প্রাণ, ছোট ছোট দুঃখ কথা, নিতান্তই সহজ সরল।' এর মধ্যে সারল্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু 'সহজ কথা সহজ করে বলা সবচেয়ে কঠিন কাজ'– একথা কবিগুরুই বলে

গেছেন। বনফুল অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন, যা আকারে ছোট হলেও ভাব-গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। সব গল্প হয়তো ছোটদের উপযোগী নয়। কিন্তু বড়োদের ভাবতে শেখায়।

এই ধারা অনুসরণ করে আমিও ছোটদের জন্য ছোটগল্প লিখছি যা ছোট হলেও যেন তাদের বেশি ভাবতে শেখায়।

শিশু-কিশোরদের মনে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন থাকে। তারা সেসব জানার জন্য বইয়ের সাহায্য চায়। তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করাও লেখকদের কাজ। যে কাজ লেখক বিনোদনমূলক লেখার মাধ্যমেও তাদের জানাতে পারেন।

সবকিছু বিবেচনা করে আমি শিশু-কিশোরদের জন্য লিখে থাকি। এটাকে আমি একজন লেখকের দায়িত্ব ছাড়াও নাগরিক-দায়িত্ব মনে করে থাকি। সেই আলোকে আমি এ গ্রন্থের জন্য গল্প বিবেচনা করেছি। ভালো লাগা, না লাগা বড়ো কথা নয়। এটাই আমার কাম্য। এ ভাবনা হয়তো শিল্প-পূজারীদের পছন্দ হবে না। আমার মতে, শিল্প তো জীবনের জন্য। এ কথা অস্বীকার করব কেমন করে?

আমার প্রচেষ্টা সফল হলে আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সূচিপত্র

বড়ো কবি	১১
একতাই বল	১৪
বড়ো দুঃখ ছোটো দুঃখ	১৮
মগজবিহীন রাজা	২২
ভাতচোর	২৬
রাজনের কথা	২৮
অভাগা	৩২
টিকেট	৩৭
হালিমার প্রথম জন্মদিন	৪১
ওরা এক বেলা খায়	৪৫
ঝরার জন্যে ভালোবাসা	৪৮
জন্মদিনের উপহার	৫৫
ফয়সল বড়ো হয়েছে	৬০
রাজুও বীর মুক্তিযোদ্ধা	৬৫
সুজন আজও ভোলেনি	৭১
মলি ও ভিখারি মেয়ে	৭৮
রাসেল ও ত্বকীর কথা	৮৩
মুক্তিযোদ্ধা রহমত	৯১
মার্বেল	৯৬
রাজা হতে হলে	৯৮
আমি বঙ্গবন্ধু হবো	১০৭
সুরেন্দ্র পন্ডিত	১১৩
পাতিকাক ও দাঁড়কাক	১১৫
ঐক্যদূত	১১৮
আত্মপ্রবঞ্চনা	১২০
মাতৃভূমির টানে	১২৪

বড়ো কবি

আমাদের ক্লাসে হিন্দু এবং মুসলমান ছাত্র সংখ্যা প্রায় সমান সমান ছিল। তখন ভারতকে দুভাগ করে ইংরেজরা বিদায় নিচ্ছে। এক ভাগের নাম ভারত ডোমিনিয়ন, অপর ভাগ পাকিস্তান। ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ দুটি স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ আর পাকিস্তানে মুসলমানরা। সুতরাং ভারত হলো হিন্দুর দেশ, আর পাকিস্তান মুসলমানের। দু'দেশেই ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। অসংখ্য নিরপরাধ মানব সন্তান নিহত হয়, আহত হয়। হিন্দুরা তাদের মাতৃভূমির মায়া ছেড়ে পাকিস্তান থেকে চলে যায় ভারতে। আবার একই ভাবে ভারত থেকে মুসলমানরা তাদের মাতৃভূমির মায়া ছেড়ে চলে আসে পাকিস্তানে। তাদের দুঃখ-কষ্ট বর্ণনাতীত।

পাকিস্তান দু'ভাগে বিভক্ত, একটি পশ্চিম পাকিস্তান, অপরটি পূর্ব পাকিস্তান। আজকের বাংলাদেশ তখন পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল।

পাকিস্তান হবার বেশ কয়েক বছর পরের ঘটনা। আমি ক্লাস সেভেন-এ পড়ি। ক্লাসে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। সবাই মিলেমিশে থাকতো। কোন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থা ছিল না। খেলাধূলাও এক সঙ্গে করতাম। পুকুরে, নদীতে এক সঙ্গে সাঁতার কাটতাম। মুসলমান ও হিন্দু ছেলে মেয়েরা পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া আসা করতো, খাওয়া দাওয়া করতো। মুসলমান ছেলেরা তাদের হিন্দু বন্ধুদের মাকে মাসীমা এবং বাবাকে কাকা বাবু বলতো। হিন্দুরা বলতো, মাসীমা, চাচি, চাচা। পুজা এবং ঈদ উৎসবে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি ছিল। কখনো মনে হতোনা এদেশে বছর কয়েক আগে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়েছিল। একে অপরকে খুন করেছে, একে অপরের বাড়ি লুঠ করেছে, আগুন দিয়েছে।

মাঝে মাঝে হিন্দু মুসলমান ছেলেদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ হলে ঝগড়া হতো, তর্কাতর্কি হতো। মুসলমান ছেলেরা হিন্দু ছেলেদের 'মালাউন'

বলতো, আর হিন্দুরা বলতো 'নেড়ে'। এ দুটি শব্দের অর্থ আমাদের জানা ছিল না। পরস্পরকে ঘায়েল করার জন্য শব্দ দুটির ব্যবহার হতো। বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করাই ছিল এর উদ্দেশ্যে।

একদিন দু'দলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নজরুল ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল। হিন্দু ছেলেরা বলছে, রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ কবি, তিনি বিশ্বকবি। মুসলমান ছেলেরা বলছে, নজরুল শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি বিদ্রোহী কবি। বিশ্বকবি এবং বিদ্রোহী কবির মধ্যে গুণগত পার্থক্য বা অর্থ আমরা কেউ জানতাম না। তবু নিজ সম্প্রদায়ের গুরুত্ব বাড়াবার জন্য আমরা ঝগড়া করতাম। একদিন ঝগড়া যখন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে তখন ক্লাসে ঢুকলেন অনিল বাবু স্যার। আমরা চুপ মেরে গেলাম। সবাই সুবোধ বালকের মতো নিজ নিজ আসনে বসে পড়লাম। বুঝবার উপায় নেই যে, কিছুক্ষণ আগে আমাদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়েছিল।

অনিল বাবু স্যার আমাদের বাংলা পড়াতেন। তাঁর ডান পা কাটা ছিল। ক্রাচে ভর দিয়ে তিনি চলাফেরা করতেন। স্যার যৌবনে রাজনীতি করতেন। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ভারতকে স্বাধীন করার জন্য। তিনি বিপ্লবী নেতা মাষ্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে তিনি আহত হয়েছিলেন। তাঁর ডান পা কেটে ফেলা হয়।

স্যার চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি নিয়ে বিবাদ করছিলে? সুকুমার দাঁড়িয়ে বললো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়ো কবি, তিন বিশ্বকবি। তার কথা শেষ না হতেই শরিফ উত্তেজিত স্বরে বললো, না স্যার, নজরুল বড়ো কবি। তিনি বিদ্রোহী কবি।

দুজনের কথা শুনে স্যার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তিনি বুঝলেন, এদের মধ্যে কবির শ্রেষ্ঠত্ব নয়, ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে। তিনি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, এত রক্তপাতের পরও আবার সেই সাম্প্রদায়িকতা?

স্যার সবাইকে বললেন, আচ্ছা বলতো পৃথিবীতে মানুষ আগে এসেছে না ধর্ম আগে এসেছে? আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, মানুষ আগে এসেছে। স্যার আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, মানুষের জন্য ধর্ম না ধর্মের জন্য মানুষ?

স্যারের প্রশ্ন শুনে আমরা একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ী করলাম। কেউ কোন জবাব দিতে পারলাম না।

স্যার বললেন, ঈশ্বর এবং আল্লাহ এক। সৃষ্টিকর্তাকে হিন্দুরা বলে ঈশ্বর আর মুসলমানরা বলে আল্লাহ। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ নিজেদের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ধর্ম প্রচার করেছে। প্রকৃত ধর্মজ্ঞানের অভাবে মানুষ হানাহানি, মারমারি, চুরি, ডাকাতি খুনসহ নানান ধরনের অপরাধ করে থাকে। কোনো ধর্মে কাউকে ঘৃণা করার কথা বলা হয়নি।

আমরা স্যারের কথা মন দিয়ে শুনলাম। কিছু বুঝলাম, কিন্তু বেশিরভাগ বুঝলাম না। আমাদের প্রশ্নের জবাব না পেয়ে আমরা উস্‌খুস্‌ করতে লাগলাম।

স্যার তা লক্ষ্যে করে বললেন, তোমরা আমার কাছে জানতে চেয়েছিলে রবীন্দ্রনাথ বড়ো কবি না নজরুল বড়ো কবি?

আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, জী স্যার।

স্যার কণ্ঠস্বর উচু করে বললেন, আরে আহাম্মকের দল, কবিরা কখনো বড়ো ছোটো হয় না। ধর্মীয় মাপকাঠিতে প্রতিভার মূল্যায়ন হয় না, কবিতার বিচার হয় না। কবিরা সকল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য গান, কবিতা লেখেন। কবিতায় তারা মানুষের জয়গান গেয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল পরস্পরকে ভালোবাসতেন। শ্রদ্ধা করতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন। একদিন ফুটবল খেলার মাঠে এক ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করায় নজরুল তাকে মারতে গিয়েছিলেন। নজরুল তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'সঞ্চিতা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যখন কোন বিরোধ নেই, তোরা অযথা তাঁদের গায়ে ধর্মের লেবাস পরিয়ে ঝগড়া করিস কেন?

স্যার উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর স্বগতোক্তি করলেন; ধর্মান্ধ এবং ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাত থেকে কবে যে ধর্ম এবং মানুষ মুক্তি পাবে? কবে যে দেশবাসী মানুষ হবে?

একতাই বল

জাফরের আজ মন ভালো নেই। সুরেশ, সুজন ক্লাসে আসেনি। কয়েক দিন আগে ওদের সঙ্গে কথা হয়েছিল, নদী তীরে সম্প্রতি আবিষ্কৃত বহু বছরের পুরানো বৌদ্ধ মন্দির দেখতে যাবে। প্রদীপ স্যার বলেছিলেন, এই মন্দির দেড় হাজার বছরের পুরাতন। স্যার নিজেও একবার দেখে এসেছেন। জাফরকে বলেছিলেন প্রাচীন সভ্যতার এই নিদর্শন দেখে আসতে। একা যেতে ভালোলাগে না, তাই জাফর সুরেশ এবং সুজনকে বলেছিল তাঁর সঙ্গে যেতে। ওরাও যেতে রাজী হয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ এক বিপর্যয় ঘটে গেল। গত পরশু কতিপয় দুর্বৃত্ত "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিয়ে সুরেশ ও সুজনদের বাড়ি আক্রমণ করে লুঠপাট চালায়, ভাংচুর করে। প্রতিমা ভাংচুর করে মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেয়। কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। সুরেশ ও সুজন তাদের ভাই-বোনকে নিয়ে মা-বাবার সাথে আত্মরক্ষার জন্য কোথায় চলে গেছে কেউ বলতে পারে না। খবর পেয়ে জাফর তার বাবার সাথে খোঁজ করতে ওদের বাড়ি গিয়েছিল। শূন্য ভিটায় বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। শুধু ওদের কুকুরটি উঠানের এক কোণে মাটির চুলার পাশে শুয়ে আছে। ওদের দেখতে পেয়ে কুকুরটি জাফরের কাছে এসে কাঁই কাঁই করছে। সম্ভবত নালিশ করছে। জাফর ওর মাথায় হাত বুলালো। গোয়ালঘর শূন্য পড়ে আছে। গরু নেই। লুণ্ঠনকারীরা সব গরু নিয়ে গেছে।

স্যার এখনো ক্লাসে আসেননি। এ ঘটনা নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে তুমুল আলোচনা চলছে, হট্টগোল চলছে। একদল ছাত্র খুব উল্লাস করছে। কিছু সংখ্যক ছাত্র চুপ করে বসে আছে। জাফর এদের দলের একজন। একজন উল্লাসরত ছাত্র বলছে, বিধর্মীর বাচ্চারা দেশ ছেড়েছে, ভালোই হয়েছে। এখন এ দেশটা হবে মুসলমানদের। ছাত্রটির নাম রফিক। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার দাদা ছিল একজন রাজাকার। সে সময় সে অনেক মানুষের ঘরবাড়ি লুঠ করেছিল। বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে পাকিস্তানি

সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিল। যুদ্ধাপরাধ আইনে বিচারে তার দাদার বিশ বছর সাজা হয়েছে। এখনো জেলে আছে।

হৈ চৈ এর মধ্যে মতিন স্যার ক্লাশে এসে ঢুকলেন। আজ তাঁর আসার কথা ছিল না। এ ক্লাস ছিল প্রদীপ স্যারের। তিনি ইতিহাসের শিক্ষক। জাফরের প্রিয় শিক্ষকদের একজন। তিনি আজ আসতে পারেননি।

মতিন স্যার ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা এত হৈ চৈ করছ কেন? কেউ এ কথার জবার দিলো না। সবাই চুপচাপ। একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। হঠাৎ রফিক দাঁড়িয়ে বললো, স্যার গত পরশু কয়েকটা হিন্দুবাড়ি ভাংচুর হয়েছে। তাদের মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে।

স্যার কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, তোমরা কি এ ঘটনায় খুশি? রফিক বললো, হ্যাঁ স্যার, আমরা সবাই খুশি। বাংলাদেশ মুসলমানের দেশ। ভারত হিন্দুদের দেশ। এ দেশের সব হিন্দুর ভারতে চলে যাওয়া উচিত। আমরা সংখ্যাগুরু, ওরা সংখ্যালঘু। বাংলাদেশ সংখ্যাগুরু মুসলমানের দেশ।

স্যার একটুও উত্তেজিত না হয়ে ধীরে সুস্থে বললেন, বাংলাদেশ কখনো শুধু মুসলমানের দেশ ছিল না, আজো নয়। পৃথিবীর অনেক দেশ ধর্মের ভিত্তিতে স্বাধীন হয়েছে। ভারত পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তিতে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ধর্মের ভিত্তিতে স্বাধীন হয়নি। এ দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য এ দেশের হিন্দু মুসলমানসহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষ লড়াই করেছে। পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে সমান ভাবে নির্যাতীত হয়েছে, মৃত্যু বরণ করেছে। আমি নিজে নাটোরে তীর ধনুক হাতে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের যুদ্ধ করতে দেখেছি।

রফিক আবার বললো, হিন্দুরা ভারত থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দিচ্ছে। আমরাও এদেশ থেকে সকল হিন্দুকে তাড়িয়ে দেব। তখন বাংলাদেশ হবে শুধু মুসলমানের দেশ।

স্যার বললেন, ভারত অন্যায় করেছে বলে আমরা অন্যায় করবো কেন? খারাপ কাজ কখনো ভালো দৃষ্টান্ত হতে পারে না। তোমরা পড়নি, 'তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?' কোন বিশেষ ধর্মের মানুষকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেই সে দেশে কখনো শান্তি আসেনা। মানুষকে ঘৃণা করা অধর্মের কাজ। একই ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশেও যে শান্তি আসে না সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এসব দেশের মুসলমানরা প্রতিদিন নিজেদের মধ্যে হানাহানি, মারামারি করছে।

একে অপরকে হত্যা করছে। এজিদ কি ইমাম হাসান, ইমাম হোসেনকে হত্যা করেনি? ইউরোপীয় দেশগুলোতে খ্রিষ্টান ধর্মালম্বীরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হলেও সেটাও এক রাষ্ট্র নয়।

স্যার একটু থেমে বললেন, রফিক, তুমি এ দেশের মুসলমানদের সংখ্যাগুরু আর হিন্দুদের সংখ্যালঘু বলেছ। বাংলাদেশ বিশেষ কোন ধর্মের লোক স্বাধীন করেনি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানদের মিলিত সংগ্রামের ফসল আজকের এই বাংলাদেশ। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দেশের ত্রিশ লাখ লোক প্রাণ দিয়েছে। এ দেশে সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু বলে কেউ নেই। সবাই একই স্বার্থে যুদ্ধ করেছে। সংখ্যালঘু যদি কাউকে বলতেই হয় তাহলে তাদের বলবে যারা একাত্তর সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল এবং এখনো যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে কাজ করছে। এরা হচ্ছে রাজাকার, আল-বদরের দল। একাত্তর সালে এরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসেবে দেশের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে, মানুষের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করেছে। দেশের মানুষের কাছে এরা ঘৃণিত রাজাকার, আল-বদর নামে পরিচিত। এদের অনেকে আজ বেঁচে নেই। কিন্তু বেঁচে আছে তাদের বংশধরেরা। তারা তাদের পূর্বপুরুষের দেশদ্রোহী চেতনা হৃদয়ে ধারন করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এরা ধর্মের ভয় দেখিয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এরা সংখ্যালঘু হলেও এদের শক্তিকে উপেক্ষা করতে নেই। এরা রক্তবীজের ঝাড়। এডিস মশা যেমন সামান্য বৃষ্টির পানি পেলে আবার জেগে ওঠে এরাও তেমনি সরকারের দুর্বলতার সুযোগে রাষ্ট্রের ক্ষতি করে বেড়ায়। স্যার বললেন, এদেশ থেকে পাঁচ লাখ হিন্দুকে তাড়িয়ে দিলে ভারত থেকে দশ লাখ মুসলমান এদেশে আসবে। তাদের জায়গা দিবে কোথায়?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্যার আবার বলতে শুরু করলেন, দেশ হচ্ছে একটি মানবদেহ। মানবদেহে যেমন হাত, পা, চোখ ইত্যাদি থাকে তেমনি একটি দেশেও হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ বহু মতের, বহু ধর্মের, বহু জাতের মানুষ বাস করে। মানুষ হচ্ছে দেশের বড়ো শক্তি, সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। এ সম্পদ নষ্ট করতে নেই। কোন মানুষের একটি হাত, একটি চোখ, একটি পা বা শরীরের কোন একটি অঙ্গ কেটে ফেললে সে মানুষ যেমন দুর্বল বা শক্তিহীন হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি একটি দেশের কোন বিশেষ ধর্ম বা